Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.29-35
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘মায়ের মুখের কথা কাইড়্যা নিতে চায়’ — ফিরে দেখা বাংলাদেশের সাতচল্লিশ–পরবর্তী সংস্কৃতিচর্চা ও গানের ধারা

ড: পৌলমী রায়
সহকারি অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী নগর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

It is undeniable that the language of any country is the greatest means of achieving the excellence of the people of that country. After the nation-division of 1947, the Bengali language and culture of East Bengal faced many obstacles. Officially, efforts were made to make Urdu the sole state language of that region. The aim was to make all the Bengali-speaking people weaker day by day, culturally and hence socio-economically. Bengalis unite against this conspiracy – the deadly history of stopping the conspiracy against the language is known to all. The Bengali-speaking people gave birth to many touching poems and songs in tragic sorrow. In this way, through various discussions, poems and songs, the conscious Bengalis made a sincere effort to get rid of the deep crisis that cultural practices faced due to the government’s hostility. In this research paper, an attempt will be made to look back at those songs of the post-independence period, which have given strength to the minds of Bangladesh and Bengalis, and have become a vehicle for declaring the oath of freedom.

Keywords: ভাষা-আন্দোলন, গান, সংস্কৃতিচর্চা, বাংলাদেশ, কথ্য–ভাষা।

ভাষার ইতিবৃত্ত বড়ো বিচিত্র। একথা অনস্বীকার্য যে কোনো দেশের ভাষা, সেই দেশের মানুষের উৎকর্ষ সাধনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তানের জন্মের পরই বাঙালির ভাষার উপরে নেমে এসেছিল আঘাত এবং সেই সময় থেকেই পূর্ববঙ্গের বাঙালির স্বকীয় সংস্কৃতিচর্চা নানা বাধার সম্মুখীন হতে থাকে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ বাঙালি জাতির জীবনে এক গভীর দাগ ফেলে। এই দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি বিভাজন সৃষ্টি হয়, যা বাংলা-ভাষাভাষী মানুষদের জীবনে নানা সংকট ও সংগ্রামের জন্ম দেয়। দেশভাগের সময় লাখো মানুষকে তাদের জন্মস্থান ছেড়ে নতুন জায়গায় বসতি গড়তে হয় – এই গৃহত্যাগ এবং পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ায় অনেকেই তাদের স্বজন, সম্পদ এবং স্বাভাবিক জীবন হারান। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে এবং জীবিকা নির্বাহ করতে গিয়ে তারা নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তাদের এক অমানবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তার উপরে, সরকারীভাবে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টা হয়। উদ্দেশ্য এই, তাতে বাঙালি দিনে দিনে সাংস্কৃতিক এবং সেই সুত্রে আর্থ-

সামাজিক ক্ষেত্রেও দুর্বল হয়ে পরবে। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালি একজোট হয় – ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রুখবার সেই প্রাণঘাতী ইতিহাস সকলের জানা।

মর্মান্তিক দুঃখবেদনায় বহু অন্তরস্পর্শী কবিতা ও সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছিল বাংলার মানুষ। এই গানগুলোতে সমাজের বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং তাদের অধিকারের জন্য লড়াইয়ের কথা তুলে ধরা হয়। বিশেষ করে বিখ্যাত গণসঙ্গীতশিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং ভবানী সেনগুপ্তের গানগুলো সেই সময়ের বাঙালির সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে; যেমন "ও আমার দেশের মাটি" গানটি দেশভাগের বেদনা এবং মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংগ্রাম এবং তাদের গাওয়া গান দেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং বর্তমান পর্যন্ত, এই গানগুলো শুধু তাদের কষ্ট ও সংগ্রামের প্রতিফলন নয়, বরং তাদের আশা, ভালোবাসা, এবং নতুন করে শুরু করার প্রেরণা হিসেবেও কাজ করে। এই গানগুলো আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সংগ্রাম এবং পুনর্জাগরণের মাধ্যমে জাতি কিভাবে এক নতুন ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

বস্তুত, বাংলাদেশের গানের কুলপরিচয় তার রাষ্ট্রীয় সীমানার আওতা ছাড়িয়ে বিস্তৃত – ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ ভূমিতেই পাওয়া যায় বাংলা গানের ধারার নদীখাত। বাংলাদেশের গানের শ্রেণীবিভাগ করলে দিনটি ধারার কথা উল্লেখ করতে হয় – এক: সাধারণ মানুষের গান বা লোকগীতি, দুই: নাগরিকদের হাতে পরিশীলিত তার উচ্চাঙ্গসুররূপ, আর তিন: কবিশিল্পীদের রচিত কাব্যসংগীত। পদাবলী থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণকীর্তন বা নাটগীতি, পাঁচালী তথা কবিগান এই কাব্যসংগীত বা 'কাব্যগীতি'-র আওতায় পড়ে। আবার, দেশজ ধ্রুপদের রীতিবাঁধনে দেশীগানের খোলামেলা চাল থেকে সরে গিয়ে সুনিবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল উচ্চ-অঙ্গের গান। তাই দেশী বা লোকগানের নির্যাসিত স্বরপুঞ্জ থেকেই বাংলাদেশের গান পায় তার মূল গড়ন। লৌকিক গীতির সাথে রাগ-সংগীতের এই আদান প্রদানের সম্পর্কটি লক্ষ করবার মতো। প্রসঙ্গত, আরেক ধরনের গানের কথা এখানে উল্লখ্য – তা হলো গণসংগীত। জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে জাতির বা সমাজের, তথা দেশের কল্যাণ সাধনার উদ্দেশ্যেই প্রধানত এই গণসংগীতগুলি প্রচলিত। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যেমন কখনো দেশপ্রেম উদ্রেকের জন্যে, কখনো বা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রয়োজনে, কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীর জন্যে সাহায্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দলবদ্ধভাবে গাইবার জন্যে এইধরনের বহু গান রচিত হয়ে এসেছে। "ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো, ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী" গানটি গেয়ে মন্বন্তরের সময়ে যেমন, তেমনই বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সাহায্য সংগ্রহ করা হয়। আবার, পাশাপাশি নজরুলের "কারার ওই লৌহকপাট", "এই শিকল পরা ছল", "তোরা সব জয়ধ্বনি কর" এইগানগুলি দেশাত্ববোধ জাগরণে বহুলভাবে গাওয়া হয়ে থাকে।

দেশভাগের পর পূর্ব-বাংলার কৃষক এবং শ্রমিকরা নানা ধরনের অত্যাচার ও শোষণের শিকার হন। জমিদার এবং মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গানের মাধ্যমেই তারা প্রতিবাদ জানাতেন। "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা" এবং "কৃষক নেতা"-এর মতো গানগুলো সেই সময়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই গানগুলোর প্রতিটি লাইনে শোষণের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ এবং সংগ্রামের আহ্বান প্রতিফলিত হয়। আবার অপরদিকে, পূর্ব-বাংলার জনগণ দিনের পর দিন যখন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকেন, তখন তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে গান হয়ে ওঠে অন্যতম প্রেরণা। "আমার

ভাইয়ের রক্তে রাঙানো”-এর মতো গানগুলো আন্দোলনকারীদের অনুপ্রাণিত করত এবং তাদের মধ্যে নতুন করে সংগ্রামের উদ্দীপনা সৃষ্টি করত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে গান সবসময়ই একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। “বাংলা মায়ের বীর সন্তান” এর মতো গানগুলো ভাষা আন্দোলনের পূর্বেই জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গানগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে শুধু সচেতনতা সৃষ্টি-ই করেনি, বরং তাদের মধ্যে একতারও বিকাশ করেছিল।

সংস্কৃতি জাতির স্বভাবসঙ্গত উত্তরাধিকার, তাই চিরপ্রবাহিত এই সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হওয়া সম্ভব - এ ছিলো ধারণাতীত। বাংলাদেশের আপন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করবার চেতনা জাগ্রত হয় পাকিস্তান আমলে। সাতচল্লিশ সালের পর সরকারি প্রতিকূলতার দরুন সংস্কৃতিচর্চা যে গভীর সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্যে সচেতন বাঙালি আন্তরিক চেষ্টায় রত হয়। বাপ-দাদার জবানের মান হারাবার ভয়ে কাতর হয়ে আবদুল লতিফ গান বাঁধেন - “ওরা আমার মুখের কথা কাইড়্যা নিতে চায়”; মোশাররফউদ্দিন আহমেদের কণ্ঠে শোনা যায় - “মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে”। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার অভিঘাতে চট্টগ্রামের ‘সীমান্ত’ পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবুল আলম চৌধুরী কবিতা লেখেন— “কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি”, গাজীউল হক লেখেন - “ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না সেই একুশে ফেব্রুয়ারি” - এতে প্রচলিত একটি গানের সুর বসিয়ে নিজাম-উল হক সদলে প্রভাতফেরীতে গেয়েছিলেন সে-বছর।

তিপ্পান্ন সালে হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ‘একুশে ফেব্রুয়ারী’ নামের স্মারকগ্রন্থ বেড় হয়। এই বইয়েই আবদুল গাফফার চৌধুরীর সেই অবিস্মরণীয় কবিতা ছাপা হয়—“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি - আমি কি ভুলতে পারি?”। এর প্রথমাংশে সুর আরোপ করেছিলেন আবদুল লতিফ। মোটামুটি সেই সুরটিকে বজায় রেখেই পরে আলতাফ মাহমুদ কবিতাটির পরবর্তী অংশে সুর দিয়েছিলেন দৃপ্ত গণসঙ্গীতের ধাঁচে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে আলতাফের সুরে সংযোজিত “জাগো নাগিনীরা জাগো” অংশসুদ্ধ পুরো গানটি গাওয়া হয় শহীদ দিবসে। উক্ত সংকলন গ্রন্থটিতে আর একটি বিশিষ্ট কবিতা বিন্যস্ত হয়েছিল - আবু জাফর ওবায়দুল্লা-র “আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি”। আবদুল লতিফের “ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়”-ও বাহান্নর পরবর্তী কালের সৃজন। গানটির সুর এবং বাণী দুই-ই আবদুল লতিফের রচনা। আবদুল লতিফ এর পাশাপাশি আরেকটি কবিতাতেও মর্মস্পর্শী সুর দিয়েছিলেন, তা হলো “রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করিলি রে বাঙ্গালী/তোরা ঢাকার শহর রক্তে ভাসাইলি”।

পূর্ব পাকিস্তান আমলে বাঙালি ঐতিহ্যের কাব্যসঙ্গীতের চর্চা সার্বিক আনুকূল্য পেত না। কাব্যসঙ্গীতের বাণী নিয়ে আপত্তি দিনে দিনে চরমে উঠেছিল। ‘চরণ’ নাকি হিন্দু শব্দ। তাই, নজরুলের “গানগুলি মোর আহত পাখির সম” গানটির “লভিবে মরণ চরণে তোমার/সুন্দর অনুপম” বাণী নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল এক প্রবীণ শিল্পীকে। একইভাবে রোষের মুখে পড়ে রবীন্দ্রনাথের “জননী তোমার করুণ চরণখানি” গান টি। গানে ‘পূজা’, ‘মন্দির’, ‘নমস্কার’ ইত্যাদি শব্দ থাকলে তো কথাই নেই, ওসব গাওয়া চলবেইনা। রেডিও বা টিভিতে গাইবার চুক্তিপত্রে সম্মতি-স্বাক্ষর দিয়ে একই সঙ্গে কর্মকর্তাদের অনুমোদনের জন্য, নির্বাচিত গানের বাণী আগে থেকেই লিখে পাঠাতে হত। পঁয়ষট্টির ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে “ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি/আমার দেশের মাটি” গানটিতে ‘বৈদিক সভ্যতা’-র গন্ধ পেয়ে

আপত্তি তুলেছিলেন টেলিভিশনের এক কর্মকর্তা। নজরুলের সৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত আর রাধাশ্যামের গান রয়েছে অসংখ্য – বিতর্ক এড়িয়ে সেসব গান গাইবার সময় এমন শব্দ বাছাই করে বাদ দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

উনিশশো একষট্টি সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মের শতবর্ষ উদ্‌যাপনে বিশ্ব যখন তৎপর, পূর্ব-পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনের আয়োজন উপলক্ষে সুস্পষ্ট আপত্তি পেশ করে। প্রচার মাধ্যমগুলিতে গোপন নির্দেশ আসা শুরু হয়, সমগ্র দেশের বাতাসেই যেন একটা নিষেধাজ্ঞা ভেসে বেড়াতে লাগে। ঢাকার একটি উদ্‌যাপন কমিটির সম্পাদক গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও টানা কয়েকদিন ধরে ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিট্যুটে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালিত হয় এবং নানান আলোচনা, গান ও নৃত্যনাট্য পরিবেশনের ভিতর দিয়ে সংস্কৃতি-কর্মীদের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিট্যুটের জমজমাট অনুষ্ঠানের পরে, একষট্টি সালের শেষ দিকে জয়দেবপুরে একটি পুনর্মিলনী হয়েছিল। সেইখানেই ‘ছায়ানট’ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম। ছায়ানটের চেষ্টা ছিল দেশের মানুষের ভিতরে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির চেতনা পুনর্জীবিত করা। তাই পুরোনো বাংলা গান থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের গান আর উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের আসর সাজাতেন তাঁরা। তবে কিছুদিনের মধ্যেই শিল্পীর অভাব প্রকট হয়ে ওঠে, অনুষ্ঠান করা কঠিন হয়ে উঠতে থাকে, তখন ‘ছায়ানট সঙ্গীতবিদ্যায়তন’ খুলবার পরিকল্পনা করা হয় – উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং তবলার হাতে গোনা ক’জন শিক্ষক নিয়ে তেষট্টি সালের এপ্রিলে স্কুলটি শুরু হয়। উদ্বোধনের দিন ছিল বাঙালি জাতীয়তার স্মারক পয়লা বৈশাখ। ছায়ানটের প্রথম কাজ ছিল বাঙালিকে আপন সংস্কৃতি বিষয়ে সজাগ করে তোলা। পরিকল্পনা ছিল ঘরোয়া পরিবেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং যন্ত্র আর কণ্ঠে রাগসঙ্গীত শুনিয়ে বাঙালিকে আপন ঐতিহ্য স্মরণ করানো; পাশাপাশি বর্ষায়, শরতে, বসন্তে ঋতু-ভিত্তিক গানের সাহায্যে বাংলার প্রকৃতিসৌন্দর্যের দিকে সকলের মন ফেরানো। শরতে-বসন্তে প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে নানান অনুষ্ঠান সাজানো হয় এবং এই ঋতুউৎসবগুলি ধীরে ধীরে ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে সর্বজনের মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। এছাড়াও দেশের পরিস্থিতি বুঝে কবিতা বা গদ্য পাঠ করে চেতনা জাগ্রত করবার চেষ্টা করা হয় – যদিও পাকিস্তান আমলে আবৃত্তিশিল্পের চর্চা তত জোরালো হয়ে ওঠেনি, অন্তত গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলন হিসেবে। ব্যক্তিগতভাবে গোলাম মোস্তফা, হাসান ইমাম প্রমুখ কয়েকজন ভালোবেসে কবিতা আবৃত্তি করতেন। পয়লা বৈশাখে এঁরা ছায়ানটের অনুষ্ঠানে নতুন দিন আর দেশের পরিস্থিতি বুঝে প্রাসঙ্গিক কবিতা পড়ে আয়োজনটিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলতেন। আন্দোলন নয়, বন্ধ হাত তুলে শপথ ঘোষণা নয়, তবু আপন সংস্কৃতি এবং পরস্পর সম্প্রীতির বোধ বাঙালির মনে সামগ্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলল সুধীরে। কামরুল হাসান, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন্নবী, প্রাণেশ মণ্ডল, বীরেন সোম প্রমুখ শিল্পী শুধু পয়লা বৈশাখ নয়, ছায়ানটের সকল অনুষ্ঠানের রূপসজ্জায় অংশ নিতেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের আবেগ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এমনকি গুরুসদয় দত্তের গানের বলিষ্ঠতা মুক্তজীবনের শপথ ঘোষণার বাহন হয়ে উঠেছিল – “ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা”, “বঙ্গ আমার জননী আমার”, “আপন কাজে অচল হলে চলবে না”, “সবারে বাস্‌রে ভালো”, “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়”, “তুমি নির্মল কর মঙ্গল”, “বাংলা মার দুর্নিবার আমরা তরুণদল”, “মানুষ হ’ মানুষ হ”, এসব গান বাঙালির মনে নতুন বল যুগিয়েছে। পাকিস্তানের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হবার আশা সাংস্কৃতিক উদ্দীপনের ভিতর দিয়ে ক্রমে শক্তি অর্জন করছিল। সেই দুর্দিনে কোনো কোনো সংস্কৃতিকর্মীকে শাস্তিমূলক বদলি করেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আয়োজনকে স্তিমিত করা যায়নি, সুদূর চাকুরিস্থল থেকে রাজধানীতে এসে অনুষ্ঠান চালিয়ে গেছেন তাঁরা। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতির

পাশাপাশি পুরোনো বাংলা গান, দেশাত্মবোধক গান আর রাগসঙ্গীত দিয়ে এক একটি অনুষ্ঠান বিন্যাসিত হতো। দর্শকদের হাতে কয়েকটি গানের কথা পৌঁছে দিয়ে অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চের গাইয়েদের সঙ্গে সমস্বরে গাইতে বলা হতো। এই গানগুলির মধ্যে মূলত ছিল – "আমার সোনার বাংলা", "এ কী অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু", "তুফান মেইল যায়"। বাঙালির অন্তরে স্মৃতিকাতরতা আর ঐতিহ্যপ্রীতি জাগাবার জন্যেই ছিল এইসমস্ত আয়োজন।

উনিশশো তেষট্টি সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আয়োজনে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' বাঙালিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ-উদ্দীপ্ত করেছিল। সপ্তাহব্যাপী আলোচনা, প্রদর্শনী, সাহিত্যপাঠ এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল সমগ্র পরিবেশ। বাঙালিত্বের চেতনা উন্মেষে এ অনুষ্ঠানের ভূমিকাও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পাকিস্তান আমলে আন্দোলন-ভিত্তিক গণসঙ্গীতের গোষ্ঠীবদ্ধ চর্চা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকে। গণসঙ্গীতের উত্থান ঘটে মূলত সমাজের নিম্নবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে। এই গানগুলোর প্রতিটি ছত্রে-ছত্রে সাধারণ মানুষের জীবনের কষ্ট, সংগ্রাম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হত। বাহান্ন সালের গোড়ায় প্রথমে 'অগ্রণী শিল্পীসংঘ', তারপর 'শিল্পীসংসদ' নামক দুটি দল গণসঙ্গীতের চর্চা করে ছোটখাট অনুষ্ঠান করতে থাকে। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীতে 'শিল্পীসংসদ'-ই মোশাররফ হোসেনের লেখা "মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে" গেয়ে প্রভাতফেরী করে। আর তার সাথে গাওয়া হয় গাজীউল হকের লেখা গান "ভুলব না, সেই একুশে ফেব্রুয়ারি, ভুলব না"। তারপরেই লেখা হয়েছিল আবদুল লতিফের প্রসিদ্ধ গান "ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়"। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গণসঙ্গীতের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ভাষা আন্দোলনের সময় বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা এবং মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে গণসঙ্গীত এক বিশাল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো"-এর মতো গানগুলো ভাষা আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হত; শিল্পীরা তাদের গানের মাধ্যমে সমাজের অসংগতি তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করতেন এবং তাদের মধ্যে সংগ্রামের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন।

একুশে ফেব্রুয়ারির আগেও কৃষক-শ্রমিকের দুর্দশা নিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলবার গান রচিত হয়েছে। এছাড়াও বঞ্চনার শিকার পূর্ববঙ্গের মানুষ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপলব্ধি করে নানা বিষয়ে গণসঙ্গীত রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরনীয় শেখ লুতফর রহমান এবং গায়ক সুখেন্দু চক্রবর্তীর নাম। তাঁর "ডিম পাড়ে হাঁসে, খায় বাঘডাঁশে" আর মতলুব আলীর শিক্ষাচেতনা-সংক্রান্ত গান "অলস হইও না ভাই ঐ ডাকে" এখনও গাওয়া হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'ঢাকা জেলা প্রগতিলেখক ও শিল্পী সংঘ'-এর কার্যকারীতা। এই শিল্পীসংঘটি শুধু সাহিত্যিকদের একটি আসর বা সংগঠন মাত্রই ছিলনা – মানুষের মধ্যে মুক্তিসংগ্রামের স্পৃহাকে ত্বরান্বিত করাই ছিল এর মৌল উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র সাহিত্যকর্ম প্রকাশনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন কৃষক-অধ্যুষিত অঞ্চলে সংগীত পরিবেশনার উদ্দেশ্যে প্রগতিলেখক সংঘের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয় 'জনযুদ্ধের গান', 'বিনয় রায়ের গান' ইত্যাদি সংকলন পুস্তিকা। ঢাকাতেও একইভাবে কৃষকদের মধ্যে সংগীত পরিবেশনের জন্যে গণসঙ্গীত রচনা করেন সাধন দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেন। এই দুজনের লেখা গণসঙ্গীতগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে লেখকসংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে

প্রচার করা হয়। যদিও এর অনেক আগে থেকেই সত্যেন সেন জনসভার জন্যে এরকম গান রচনা করে আসছেন। তার অন্যতম একটি ছিল “আগুন নিভাইব কে রে/ও আগুন নেভে, নেভে, নেভে না”। জনজাগরণে আন্দোলনের জন্যে এধরণের গান ছিল অত্যন্ত উপযোগী। গ্রামাঞ্চলে বক্তৃতা করবার পরে কথাগুলো সুরে গাইতে পারলে, তা সাধারণ মানুষের মনে সহজে প্রবেশ করে। সুরের মোহন আকর্ষণে মানুষ যতটা আকৃষ্ট হয়, শুকনো বক্তৃতায় তত নয়। সুরে জানানো তত্ত্বকথাও তখন অন্তরে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এই কথাটি অনুধাবন করেই প্রবীণ বয়সে সত্যেন সেন নব উদ্যমে ‘উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী’ (১৯৬৮) গড়ে তুলেছিলে, যা বাংলাদেশের গণজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন সকল সচেতন বাঙালি উপলব্ধি করলেন যে সমসাময়িক ঘটনার দিকে নজর রেখে মানুষকে জাগাবার জন্যে গান গাওয়াও কতখানি জরুরী, তখন ছায়ানট-এর বিদ্যায়তনের শিক্ষক তথা সুরকার শেখ লুতফর রহমান শিক্ষার্থীদের সিকান্দার আবু জাফরের লেখা “জনতার সংগ্রাম চলবে”, আবুবকর সিদ্দিকের লেখা “বিপ্লবের রক্তরাঙা ঝান্ডা ওড়ে আকাশে”, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার অংশবিশেষে সুরারোপিত “ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য” গানগুলির সাথে সলিল চৌধুরীর “আমার প্রতিবাদের ভাষা”-র মতো গান শিখিয়ে চতুর্দিকে গাওয়াতে শুরু করলেন।

সঙ্গীত এবং নৃত্যচর্চার আরেকটি নামী প্রতিষ্ঠান ছিল ‘বুলবুল ললিতকলা একাডেমী’ বা ‘বুলবুল একাডেমী অফ ফাইন আর্টস’, সংক্ষেপে ‘বাফা’। বাফা-র ওয়াইজ ঘাটের বাড়ীতে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং নৃত্যের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। এদের বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মঞ্চ প্রস্তুত করে নৃত্য এবং সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হত প্রায়শই – এমনই এক অনুষ্ঠানে বাফা থেকে একবার শান্তিদেব ঘোষের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের ‘শ্যামা নৃত্যনাট্যে’-এর দলকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল, নাম ভূমিকায় গান গেয়েছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। উনিশশো একষট্টি সালে ঢাকায় রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠানগুলোতে বাফা-র সঙ্গে সঙ্গে মক্‌সুদুস্‌ সালেহীন, বজলুল করিমদের ‘ঢাকা ড্রামা সার্কল’ আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের একক শিল্পীরা গুরুত্ববহ ভূমিকা পালন করেন। হিন্দু কবি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সরকারি ভ্রূকুটি টের পাওয়া গেলেও আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অভূতপূর্ব সাফল্য, বাঙালির মনে আপন ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে সর্বতভাবে সক্ষম হয়।

উনিশশো তেষট্টি (১৯৬৩) সালের শেষভাগে বারীণ মজুমদারের মিউজিক কলেজের প্রতিষ্টা হয়। উনিশশো আটষট্টি (১৯৬৮) সালে রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী জাহিদুর রহিমের অকালমৃত্যুর পর, তাঁর স্মরণে দুটি সাংস্কৃতিক উদ্যোগ গৃহীত হয়। বাংলাদেশের শিল্পীদের গান ধরে রাখবার কোনো ব্যবস্থা নেই – এই আক্ষেপের অবসান ঘটিয়ে জাহিদ সহ বেশ কয়েকজন রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর গান রেকর্ড করে ‘বাঁশরি ও নির্মাল্য’ শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে, ‘বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ নাম দিয়ে মুক্তিসংগ্রাম-ভিত্তিক গানগুলির একটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ঠিক তার পরেই বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত “আমার সোনার বাংলা” ও “ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা” গানদুটির একটি এক্সটেন্ডেড প্লে মুদ্রিত হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পরবর্তীতে বেতারে সম্প্রচারিত সংগীত, কথিকা প্রভৃতিও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো প্রচারণা ছিল। জহির রায়হান কয়েকটি দৃপ্ত গান, যেমন – “জনতার সংগ্রাম চলবে”, “ব্যারিকেড বেয়োনেট বেড়াজাল”, “জাগো, প্রদীপ নিভায়ে দাও”, “সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে”, “ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা”, “দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে” – এগুলিকে একত্রিত করে ধারাবিবরণী লিখে গ্রন্থনা করবার কাজে নিমগ্ন হলেন। তার নেতৃত্বে শাহরিয়ার কবীর গীতি-আলেখ্য তৈরি করে ‘রূপান্তরের গান’ নামে বাংলাদেশের

ইতিহাসমূলক বিবরণ তৈরি করেন এবং এতে একক কণ্ঠের "সার্থক জনম আমার" আর "বলো ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ" গান দুটিও বিন্যাস করা হয়।

প্রতিবাদী গান শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম ছিল না, এটি ছিল আন্দোলনের হাতিয়ার। এই গানগুলো সমাজের অন্যায় এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি যোগাত। শিল্পীরা তাদের গানের মাধ্যমে সমাজের অসংগতি তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করতেন এবং তাদের মধ্যে সংগ্রামের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন। প্রতিবাদী গানগুলোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হত এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব বিস্তার করত। এই গানগুলো শুধুমাত্র আন্দোলনকারীদের যে প্রেরণা জুগিয়েছিল, তাই নয়, বরং ভবিষ্যতের আন্দোলনের জন্যও ভিত্তি তৈরি করেছিল।

আরো একটি কথা না বললে অসম্পূর্নতা থেকে যায়, তাহলো – একাত্তর সালে শরণার্থী শিবির আর মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে যেভাবে দলবদ্ধভাবে দেশপ্রেমের গান গেয়ে সকলের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রদীপ্ত করে তোলা হয় – যুদ্ধাবস্থায় মানসিক শক্তি সঞ্চারে সঙ্গীতের এই ব্যবহার ছিল জরুরী এবং ফলপ্রসূ। স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে সাংস্কৃতিক মুক্তিসংগ্রাম বহুলাংশে প্রেরণা যুগিয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যুক্ত করে। এই সময়ে বাংলা গান এক নতুন মাত্রা পায়। "আমার সোনার বাংলা" এবং "জয় বাংলা বাংলার জয়"-এর মতো গানগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটায়। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলা গানের মাধ্যমে নতুন করে জাতির পুনর্গঠন এবং স্বাধীনতার আনন্দ উদযাপন করা হয়। দেশের উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইয়ের কথা গান এবং কবিতায় প্রতিফলিত হয়।

আসলে, কোনো রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক রূপরেখা সবসময় সেই দেশের মাটি, জল, আবহাওয়ার মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে – বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ধারাও তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জাতিগত ঔপনিবেশিক শোষণের প্রস্তুতিপর্বে বাংলাভাষার উপর আঘাতটা যখন আসে, দেখা যায় সেই আঘাত গিয়ে লাগে সমাজের মর্মমূলে – উপরন্তু সমগ্র দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর। তাই সেই সময়ের গান ও সংস্কৃতিচর্চার ধারাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে, সেখান থেকে কাম্য সমাজের যে চেহারাটি ফুটে ওঠে, তা একটি মুক্ত, প্রগতিশীল, আপন-সংস্কৃতির বোধে উজ্জ্বল, ধর্মনিরপেক্ষ এবং পর-শোষণমুক্ত একটি সমাজেরই চিত্র।

তথ্যসূত্র:

1) আবুল ফজল, সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা. চট্টগ্রাম, ১৯৬০
2) সানজিদা খাতুন, রবীন্দ্রনাথ: তার আকাশ-ভরা কোলে. ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৭
3) হাসান আজিজুল হক, অপ্রকাশের ভার. ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮
4) শামসুজ্জামান খান, সেলিনা হোসেন, জাকিউল হক (সম্পা.) একুশের স্মারকগ্রন্থ '৯০. ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০